যিনি না এলে অন্ধকার থাকতো নারীদের জীবন

সংশপ্তক হাসান

দ্বাপর যুগ বা তারও আগে থেকে নারীরা নিষ্পেষিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মোড়কে পুরুষতান্ত্রিকতার শেকলে বন্দি তারা। ফলে যত না মানুষ তার চেয়ে বেশি বাঁচতে হয়েছে পুরুষের ইচ্ছার পুতুল হিসেবে। এই অন্ধকার থেকে নারীকে মুক্তির বার্তা দিতেও কালে কালে বিষ্ণুর অবতারের মতো এসেছেন অনেকে। তাদের মধ্যে অন্যতম বেগম রোকেয়া। নারী জাগরণে যিনি নিজের পুরো জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যার জন্ম না হলে হয়তো আজও দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত অক্ষর জ্ঞানহীন থাকতে হতো নারীকে।

জন্ম থেকেই বঞ্চনা

বেগম রোকেয়া ১৯৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার। রোকেয়ার মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। বেগম রোকেয়ারা ছিলেন তিন বোন তিন ভাই। ভাইদের একজন শৈশবেই মারা যায়। জমিদার আবু আলী হায়দার শিক্ষা দীক্ষায় ছিলেন অনন্য। আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় দখল ছিল তার। তবে জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃত হলেও বেশ সংকীর্ণমনা ছিলেন তিনি। এই সংকীর্ণতা ছিল শুধু নারীকেন্দ্রিক। নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই বেগম রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাসরত অবস্থায় পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষিকার কাছে কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের আপত্তি ও কটাক্ষের কারণে বন্ধ করে দিতে হয় তা।

সহোদর-সহোদরার সহায়তা

আবু আলী হায়দার দুই ছেলে মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ালেখা করালেও রোকেয়া ও তার বোনেদের ব্যাপারে শিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। কিন্তু তার ছেলেরা অর্থাৎ রোকেয়ার বড় ভাইয়েরা ঠিকই বোনদের পড়ালেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। আর এর পেছনে ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ভূমিকা। এখানে পাঠ গ্রহণ করে

আধুনিকমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন রোকেয়ার ভাইদ্বয়। বড় বোন করিমুন্নেসাও ছিলেন বিদ্যুৎসাহী। তাদের অনুপ্রেরণায় সাহসী হয়ে শিক্ষা লাভ শুরু করেন রোকেয়া। আস্তে আস্তে আরবি ফার্সি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন। তবে সেটিও করতে হতো গোপনে। এ বিষয়টি উঠে এসেছে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখায়ও। তিনি তার 'বঙ্গের মহিলা কবি' বইয়ে লিখেছেন, 'বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে মিসেস আর এস হোসায়েনের নাম স্মরণীয়। বাঙ্গালাদেশের মুসলমান-নারী-প্রগতির ইতিহাস-লেখক এই নামটিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না। রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে চুপি চুপি বিছানা ছাড়িয়া বালিকা মোমবাতির আলোকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ইংরাজী ও বাংলায় পাঠ গ্রহণ করিতেন। পদে পদে গঞ্জনা সহিয়াও এভাবে দিনের পর দিন তাঁহার শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। কতখানি আগ্রহ ও একাগ্রতা থাকিলে মানুষ শিক্ষার জন্য এরূপ কঠোর সাধনা করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।'

নতুন জীবন

১৮৯৮ সালে ১৮ বছর বয়সে নতুন জীবনে পা রাখেন বেগম রোকেয়া। ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। উর্দুভাষী সাখাওয়াত সাহেব ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পাশাপাশি সমাজ সচেতন প্রগতিশীল এবং কুসংস্কার মুক্ত একজন মানুষ। ফলে বড় ভাইদের মাধ্যমে শিক্ষার যে দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছিল বেগম রোকেয়ার সামনে তা আর রুদ্ধ হয়নি। বরং সাখাওয়াত হোসেন সেই পথ সুগম করেছেন। রোকেয়ার সাহিত্য চর্চায়ও ভূমিকা রয়েছে তার স্বামীর। তার উৎসাহেই দেশি-বিদেশি লেখালেখির সঙ্গে যোগাযোগ হয় বেগম রোকেয়ার। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতাও বাড়ে স্বামীর মাধ্যমে। তবে স্বামী সান্নিধ্য বেশি দিন পাননি বেগম রোকেয়া। বয়সেও ছিল বিস্তার ফারাক। ভদ্রলোক বেশি দিন বাঁচেননি। ১৯০৯ সালে তিনি মারা যান। দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। তবে তারাও অকালে প্রাণ ত্যাগ করে। স্বামীর প্রয়াণের পর সাহিত্য চর্চা ও নারী শিক্ষার অগ্রগতি একমাত্র কাজ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ এ মহীয়সী নারীর।

নারী শিক্ষায়

স্বামী বিত্তশালী হওয়ায় তার মৃত্যুর পর বেশ কিছু সম্পদ অর্জন করেন বেগম রোকেয়া। সেখান থেকে অর্থ নিয়ে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর ভাগলপুরে গড়ে তোলেন নারীদের একটি স্কুল। মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সে যাত্রায় সফল হননি বেগম রোকেয়া। উল্টো হন ষড়যন্ত্রের শিকার। নারী শিক্ষা কার্যক্রম থামাতে তাকে মিশনারিদের চর অপবাদ দেওয়া হয়। এতে সামাজিকভাবে নিন্দিত ও অপদস্ত হন বেগম রোকেয়া। বিষয়টি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলে তাকে। লজ্জা অপমান সইতে না পেরে চলে আসেন কলকাতা। তবে ভাগলপুর ছাড়লেও নিজের লক্ষ্যে অটুট ছিলেন রোকেয়া। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ওয়ালিউল্লাহ লেনের ভাড়া বাড়িতে ফের শুরু করেন সাখাওয়াত বালিকা বিদ্যালয় নামে স্কুলটি। ছাত্রী ছিল আটজন। শুরু হয় রোকেয়ার যুদ্ধ। ছাত্রী সংগ্রহে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেন। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে থাকেন অভিভাবকদের। তবে এই পথচলা এত সহজ ছিল না। কিন্তু বেগম রোকেয়া আর্থিক অসুবিধা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা পায়ে দলে স্কুল নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। এ অবস্থায় তার পাশে বেশ কিছু জনহিতৈষী ব্যক্তি দাঁড়ান। তাদের সহায়তায় ও রোকেয়ার দৃঢ় মনোবলে স্কুলটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নারী উন্নয়নে

বেগম রোকেয়া শুধু নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাননি। নারী উন্নয়নে আরও বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। নারী উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' গঠন করেন। নিরক্ষর ও দরিদ্র নারীদের আত্মরক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করতে থাকে। আর্থিক সাহায্য বাদে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে নারীদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল মুসলিম মহিলা সমিতির লক্ষ্য। নারীদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার গল্প খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন বেগম রোকেয়া। ছিল নিজের অভিজ্ঞতাও। ফলে নারীদের কষ্ট খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন তিনি। নারী উন্নয়নে শুধু কাজই করেননি রোকেয়া। দিয়েছেন নেতৃত্বও। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন তিনি। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে রাখেন বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

যা পছন্দ ছিল না

নারী শিক্ষার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বেগম রোকেয়া কিছু জিনিস পছন্দ করতেন না। এরমধ্যে একটি মুখস্ত বিদ্যা। রীতিমতো ঘৃণা করতেন। পবিত্র কোরআনের ক্ষেত্রেও একই আচরণ ছিল তার। নারীদের ধর্মীয় শিক্ষায় পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবরের ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি।

সাহিত্যিক

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য প্রতিভা বিকাশও খুব দেরিতে হয়নি। বালিকা বয়সেই তার লেখালেখি শুরু। সেসব লেখা নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হতো। ১৯০২ সালে বেগম রোকেয়ার বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'নব প্রভা'য় ছাপা হয় তার একটি রচনা। শুধু বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না লেখালেখি। ইংরেজিতেও লিখতেন। ১৯০৫ সালে ১৭ বছর বয়সে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয় রোকেয়ার প্রথম ইংরেজি রচনা 'সুলতানা'স ড্রিম' কিংবা 'সুলতানা স্বপ্ন'। ওই সময়েই তার লেখাগুলো বিভিন্ন মহলে সমদৃত হয় এবং সাহিত্যিক হিসেবে তিনিও বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। বইয়ের সংখ্যা কম হলেও সাহিত্যে বেগম রোকেয়া বেশ পরিপক্ক ছিলেন। তখনকার দিনের বোদ্ধাদের অনেকেই তার লেখার প্রশংসা করেছেন। তার শাণিত লেখনি যেমন পুরুষ শাসিত সমাজকে বিদ্ধ করেছে, তেমনই নারীদের সামনে এগিয়ে যেতে যুগিয়েছে প্রেরণা। তার কবিতা রচনা ব্যঙ্গ প্রবন্ধ সবকিছুই ছিল নারীর কল্যাণে রচিত। এই মহীয়সী নারীর বইয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। সংখ্যায় অল্প হলেও সেগুলো ছিল ভীষণ শক্তিশালী। তার লেখা বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। এরমধ্যে উপন্যাস 'সুলতানাস ড্রিম' নিয়ে স্প্যানিশ নির্মাতা ইসাবেল হারগুয়েরা তৈরি করেছেন অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র। যার নাম 'এল সুয়েনো দে লা সুলতানা'।

ইহলোক ত্যাগ

বেশি দিন বাঁচেননি বেগম রোকেয়া। ১৯৩২ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাকে সমাহিত করা হয় উত্তর কলকাতার সোদপুরে। পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক অধ্যাপক অমলেন্দু দে খবরটি আবিষ্কার করেন। মৃত্যুর সময় ও সাহিত্যচর্চায় মগ্ন ছিলেন বেগম রোকিয়া। সে সময় তিনি লিখছিলেন নারীর অধিকার নামে একটি প্রবন্ধ।

স্মৃতিচারণ

রংপুরের মেয়ে বেগম রোকেয়া। এখানে তার স্মরণে সরকার একটি গণউন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এছাড়া রংপুরে তার নামে করা হয়েছে বেগম রোকেয়া বিশ্বদ্যিালয়। রংপুর জেলার মিঠাপুর উপজেলার পায়রা বন্ধ গ্রামে রোকেয়ার পৈত্রিক ভিটায় নির্মাণ করা হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র।